*Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-2(2024), p08-26. (*ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal

বাংলাদেশের কবিতা: নারীর অন্তঃস্বর

ড. ইয়াসমিন আরা সাথী
বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সংক্ষিপ্তসার:

বাংলাদেশ নামক একখণ্ড মানচিত্রের সাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরশাসন, মৌলবাদের আগ্রাসন প্রভৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় 'স্বাধীন বাংলাদেশ'। সেই স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতা বড় করুণ। নারী এই প্রতিকূলতার মাঝে দাঁড়িয়ে তার কাব্য রচনা করে যাচ্ছে। আধিপত্যবাদী সমাজের চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে এদেশের নারীরা কবিতা লেখা শুরু করেছে। ষোড়শ শতকের নারী কবি চন্দ্রাবতীকে প্রথম কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও উনিশ শতকে এসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বিশ শতকের ষাটের দশকে সুফিয়া কামাল, খালেদা এদিব চৌধুরী; সত্তর দশকে মেহেরুন নেসা, রুবী রহমান, কাজী রোজি, শামীম আজাদ, সুরাইয়া খানম, দিলরুবা মিজু; আশির দশকে ফেরদৌস নাহার, জিনাত আরা রফিক, নাসিমা সুলতানা, তসলিমা নাসরিন; নব্বইয়ের দশকে কচি রেজা, শাহনাজ মুন্নি, শেলী নাজ; একুশ শতকের শূন্য দশকে মেঘ অদিতি, আয়েশা ঝর্ণা, অলকা নন্দিতা, মৃত্তিকা গুণ; প্রথম দশকে রিমঝিম আহমেদ, হোসনে আরা জাহান, মাহী ফ্লোরা, সালেহিন শিপ্রা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সূচক শব্দ: গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রতিকূলতা, অগ্রাহ্য, অন্তঃস্বর, মৌলবাদ

বাংলাদেশের কবিতায় নারী প্রগতিবাদী ধারণার অন্যতম কবি সুফিয়া কামাল (১৯১১—১৯৯৯)। কবিতা, গল্প, নাটক, আত্মকথনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। নারীর স্বাধীনতা ও অধিকারের দাবীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে আজীবন কাজ করেছেন। ৮৯ বছরের দীর্ঘজীবনে একটি পিছিয়ে পড়া, শিক্ষাহীন ও কুসংস্কারে সর্মপিত জাতিকে তিনি উজ্জীবিত করে গেছেন পরিবর্তনের মন্ত্রে।[1] নারীকে তিনি পূর্ণমানব হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজের নানা প্রতিকূলতায় নারী পিছিয়ে পড়ে। সুফিয়া কামাল মনে করেন, নারী সত্তার জাগরণ, শিক্ষা এবং সাহসই পারে নারীকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে। তিনি মনে করেন :

অঙ্গনাই বাহিরে ও ঘরে

সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ রূপ। অনবদ্য বাৎসল্য ও সুধা
বিলায়ে দাক্ষিণ্যভারে মিটাইয়া পিপাসা ও ক্ষুধা
অঙ্গনারা জাগে
পুষ্পের সুগন্ধি সম মৃত্তিকার মত অনুরাগে।[2]

প্রথম জীবনে বেগম রোকেয়ার সাথে পরিচয় তাঁর জীবনদর্শনকে পাল্টে দিয়েছিল। সাহস জুগিয়েছে প্রান্তিকায়িত নারীর জন্য কাজ করার। অল্প বয়সে বৈধব্য তাঁকে অবরোধবাসিনী করতে পারেনি। বরং চাকরি নিয়েছেন কলকাতা পুরসভায়। সদস্য হয়েছেন রোকেয়ার গড়া আন্জুমানে খাওয়াতিন—ই—ইসলামের, যুক্ত হয়েছেন অল ইন্ডিয়া উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশেনের।[3] বিভাগোত্তর বাংলাদেশে নারীর অধিকার নিশ্চিত এবং নারীর সুরক্ষায় কাজ করে গেছেন। নারীর মুক্তিকে বিশেষ কোনো তত্ত্বের মধ্যে না দেখে রাজনৈতিক—সামাজিক—রাষ্ট্রিক বাধ্যবাধকতায় নিয়ে আসার প্রয়াসী ছিলেন। সুফিয়া কামালের সময়ের বাংলাদেশ আর বর্তমানের বাংলাদেশের অনেক পরিবর্তন এসেছে। নারীর জীবনমান উন্নয়নে তার দেখানো পথেই নারীরা আজ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতীচ্যের নারীচেতনাবাদী ভাবনার সাথে সুফিয়া কামালকে মেলানো যাবে না। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের পথ ধরেই তাঁর নির্মিতি পূর্ণতা পেয়েছে। সুফিয়া কামালের স্বপ্ন—সম্ভাবনা, আশা—নৈরাশ্য এই শতকের পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছিল। সেই সময় একজন মুসলিম মধ্যবিত্ত নারীর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ অনেক বেশি কঠিন ছিল। তারপরও সুফিয়া কামাল নারীর অধিকারবলীর প্রতিষ্ঠার যে দাবী জানিয়েছেন তখনকার সমাজসংস্কৃতির পরিবেশে তা বৈপ্লবিক। বিশটিরও অধিক কাব্যগ্রন্থের স্তবকে স্তবকে মিশে আছে প্রেম, প্রকৃতি,সমাজভাবনা, বেদনার স্মৃতি এবং ধর্মীয় আবেগ। তাঁর অনুপেরণার জায়গা ছিল তাঁর মা সৈয়দা খাতুন।

ঔপনেবেশিত ভারতবর্ষে নারীনিগ্রহের এই জটিল মনস্তত্ত্বের দিকটি সুফিয়া কামাল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সোভিয়েটের দিনগুলি, একালে আমাদের কাল এবং একাত্তরের ডায়েরী তিনটি স্মৃতিগ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নারীর বাইরের জগৎ দেখার আখ্যান। তিনি ডিঙিয়েছেন সকল বাধা কখনো পর্দার মোড়কে আবৃত হয়ে সমাজসেবা করেছেন, আবার কখনো ছুটে গেছেন রাজনীতির মাঠে গান্ধীজি দর্শনে। দেশভাগের পর ভাষা আন্দোলনে নারীদের মিছিল সংগঠিত করেছেন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন, গণ—অভ্যুত্থানে নিজের নেতৃত্বে মিছিল করার পাশাপাশি প্রত্যাখ্যান করেছেন সরকারি পদক। ক্রমেই তিনি হয়ে উঠেছেন সর্বজনমান্য ও নন্দিত নারী।[4]

দীওয়ান কাব্যগ্রন্থের শ্রীময়ী শ্রীমতি তারা কবিতায় নারীর মমতাময়ী রূপটি তুলে ধরেছেন। নারীকে সংসার বিচ্ছিন্ন নয় সংসারের মধ্য থেকেই তিনি নারীর মুক্তি চেয়েছেন :

সুসম্পন্ন শান্তিভরা নীড়
তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যজি পরিপূর্ণ আনন্দে নিবিড়
শুধুই রমণী নহে, ভগ্নী বধূ মাতা কন্যা রূপে
দিবস শর্বরী আর যুগে যুগে জাগি চুপে চুপে

এ নিখিলে রাখিয়াছে শাকান্নে যে অমৃতের স্বাদ
ক্ষুধিত স্বজন তরে, বিধাতার পরম প্রসাদ
পোষ্য পরিজন তরে প্রিয় প্রসাদনে
বিথরিয়া গৃহে অঙ্গনে অঙ্গনে
শ্রীময়ী শ্রীমতী তারা।[5]

নারী সর্বংসহা তাই নারী জাতিকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন। তাঁর নারী জাগরণী বানী বাঙালি নারীকে সম্মান জানিয়েছে :

নারী সে বিচিত্র রূপে তার
গৃহে ও বাহিরে করে কর্মক্ষেত্র প্রসারি আবার
জননী স্তন্যদানে, ভগিনী কৈশোর খেলা সাথী
পুরুষের। সন্ধ্যায় সে বধূরূপে জ্বালে গৃহবাতি
কঠোর সংগ্রামময় জীবনের অন্ধকার রাতে
আশার বর্তিকা নিয়ে হাতে।[6]

নারী তার আপন ব্যক্তিত্বে পরিবারের সবার মন জয় করে। মাতা—ভগ্নী—পত্নীরূপে সংসারেও তার নিত্য অবস্থান। এই নারী যখন সংসার সংগ্রামে বাহিরে আসে পথের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে। অর্থাৎ পরিবার এবং সমাজে নারীর বহুমাত্রিক অবস্থানকেই দেখিয়েছেন :

কর্তব্যে সবার তার সুদৃঢ় প্রত্যয়
দারুণ দুঃখের রাত্রে অন্তর অভয়
অক্লান্ত করিয়া রাখে, মৃদু স্মিত হাসি
সাফল্য শপথে ওঠে অধরে উদ্ভাসি।[7]

নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা চেয়েছেন প্রচলিত তত্ত্ব—কাঠামোর মধ্যে নারীকে তার জীবনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে সমস্যার সমাধান করতে। সুফিয়া কামাল নারীর অস্তিত্বের সমস্যার সমাধান কোনো তাত্ত্বিকতায় না গিয়ে সরাসরি রাজপথে নেমেছেন। ইসলাম ধর্মে নারীর শিক্ষা অর্জন এবং সম্পত্তিতে অধিকার দিলেও বৈবাহিক ক্ষেত্রে পুরুষ অধিকারের অগ্রগণ্যতার কারণে নারীকে অনেক ক্ষেত্রে হেয় হতে হয়। যেমন মুখে তালাক বললে তালাক বলে ধরে নেওয়া হয়। মূর্খ মোল্লারা ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে এই বিষয়টি কাজে লাগিয়ে নারী নির্যাতন করে। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সুফিয়া কামাল অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ ছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি অসীম সাহসের সাথে কথা বলতে একটুও পিছপা হননি।[8] ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীর প্রতি অবমাননা বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন :

স্বামীরা বলে কি, ভাত রাধতে পারিস না তোরে তালাক দিলাম। মোল্লা সাহেবরা বলেন, এইতো তালাক হয়ে গেছে। এ বৌ নিয়ে আর ঘর করতে পারবে না। ওরে আরেকটা বিয়ে দাও। হিল্লা সরা কর।...ধর্মের নামে এসব অনাচার আমি মানি না। এ জন্যই মেয়েদের পাশে আমি দাঁড়িয়েছি।[9]

নারীর প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সরব কণ্ঠস্বর। কবিতার মাধ্যমে নারীদের সবসময় উৎসাহিত করেছেন:

তোমরা জাগাও নব জীবনের স্পন্দনে ভরা দিন,
নব সৃজনের উদাত্ত গানে দিন হোক অমলিন।
যেখানে বেদনা অপমান আর ক্ষমাহীন অবিচার
অজ্ঞানতার অসুর যেখানেকরিয়াছে অধিকার
দুর্বল ভীরু অসহায় জনে, সেখানে জ্বালিয়া আলো
সেবাধর্মের কর্মজীবন দাও, দূর করি কালো
ভীতি ভয় আর হিংসা দ্বেষের। দীপ্তজীবন মন
সকলের তরে সকলের প্রীতি মধুময় বন্ধন।[10]

শুধু দেশের নারীদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে ভেবেছেন তাই নয় বর্হিবিশ্বের নারীর দুর্দশাও তাঁর কবিতায় এসেছে। আলজিরিয়ার স্বাধীনতায় নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন :

তুমি অতুল্যা ! ধরার দুলালি ! জমিলা জননী মাগো !
মুক্তি আলোক জ্বেলেছো, জ্বালিয়া জ্বালিয়া জাগিছো মাগো !
আর দেরী নাই, মায়ের মুক্তি মাগি দিল যত প্রাণ
সেই কঙ্কালে ঝঙ্কারি ওঠে জিঞ্জরভাঙ্গঙা গান।[11]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যপ্রবণ নেতিবাচক মানসিকতার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। জননী সাহসীকা রূপে বাংলা কাব্যে তাঁর খ্যাতি। নারী ও ধরিত্রী কবিতায় সেই জননীর জয়গাঁথাকে নির্মাণ করলেন এভাবে:

অনেক রৌদ্রের দাহ, অনেক ঝঞ্ঝার প্রহরণ,
অনেক প্লাবন মারী, বহুহৃদি রক্তের ক্ষরণ
সহিয়াও জননী বসুধা
ঋতুপাত্র ভরি ভরি এনে দেয় নিত্য নব সুধা।
এ ধরিত্রী মাতা ও দুহিতা
সর্বংসহা, শান্ত, অনিন্দিতা।[12]

এ প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্য 'মাতৃত্বকে নারীর সংকট, সমস্যা কিংবা দুর্বলতা হিসেবে দেখার প্রবণতা থেকে ভিন্ন তাঁর উপস্থাপনা। মাতৃত্ব ও মাতৃপ্রতীক তাঁর লেখায় বরং মহিমান্বিত। তবে মহিমার টানে পিছু হটে গিয়ে নারী ঘরকেই নিয়তি হিসেবে বেছে নেয়নি।[13]

নারী গর্ভধারণ করে বলেই অন্যদের থেকে আলাদা। মাতৃত্ব নারীর জীবনের সংকটকে কখনোই প্রকট করে না। বরং মাতৃত্বের কারণেই সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ সহনুভূতি, সেবা—শুশ্রূষার বৃত্তি পুরুষদের থেকে অনেক বেশি। সুফিয়া কামালও নারীদের শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাজ করেছেন। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই নয় নারীবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে তিনি ছিলেন নেতৃত্বস্থানীয়। তিনি এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরনের প্রতিবাদ করেছেন।

নারী জাগরণের পুরোবর্তিনী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের যোগ্য উত্তরসুরী সুফিয়া কামাল ছিলেন সময়ের চেয়ে অগ্রবতীর্ মানুষ। আমাদের বিশ্বাস এবং চিন্তার মুক্তির নিবিড় পথপ্রদর্শক। রোকেয়ার মধ্যে যে যুক্তিবাদীতা, বাস্তবতা, ভাবুকতা লক্ষ্য করা সুফিয়া কামালের মধ্যে একই যুক্তিবাদীতা এবং নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। তিনি কবিতার মাধ্যমে নারীদের সাহস দিয়েছেন শক্তি জুগিয়েছেন :

হে অমৃত কন্যা ! পিয়ো তীব্র হলাহল।
ভয় নাই ! তব শুভ্র প্রাণ শতদল
রহিবে অম্লান দ্যুতিময়
কণ্ঠে কণ্ঠে ওঠে জয় জয়।[14]

বিশ শতকের সত্তর দশকে ইন্দিরা গান্ধীর (১৯১৭—১৯৮৪) নেতৃত্ব বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর কর্মজীবনের সাফল্য ও কৃতিত্ব সুফিয়া কামাল উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী জীবনকে দেখতেন বহুবিধ বিষয়ের একটি সমষ্টি হিসেবে। সুফিয়া কামাল ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে লিখেছেন 'শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে' :

নিবিড় তামসী রাত্রি আজি যদি হলো অবসান
হে শক্তি—স্বরূপ নারী ! এ তোমার দান।
শক্তিমতি সাহসিকা হে অতুলনীয় !
আপনার মহিমায় নিজে তুমি আছ উদ্ভাসিয়।[15]

সুফিয়া কামালালের কবিতায় নারীবাদের সরব ধ্বনি না থাকলেও নীরব এক প্রত্যাখ্যান ছিল। তবে সেই প্রত্যাখ্যানের ভাষা রূঢ় নয়। নারী—পুরষের যৌথতায় মুক্তি। নারীর লড়াই একলার নয়, এক আধিপত্যের বিরুদ্ধে আরেক আধিপত্য কায়েম নয়। নারী—পুরুষের সহাবস্থান ও সহনশীলতার পাঠ আমরা তাঁর কবিতা থেকে পায়।[16]

সুফিয়া কামালের কবিতায় নারী ও মাতৃসত্তা একইসূত্রে গাঁথা। সংসারের নৈমিত্তক্তাকে স্বীকার করে নারী যে এগিয়ে যেতে পারে তা তিনি দেখিয়েছেন। কবিতায় সমতার কথা বলেছেন, মানবতাবোধের কথা বলেছেন, রাজনীতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। দেশের সংকটে তাঁর কলম কখনো নিস্তব্ধ থাকেনি। স্বাধীনতাযুদ্ধে দেশ কেঁপে ওঠে, তছনছ হয়ে ওঠে দেশবাসীর অবস্থান। ত্যাগ ও গৌরবগাঁথার এই নির্মাণকে তিনি সৃজন করলেন কবিতায়। কবি মেহেরুননেসা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই যাকে হত্যা করা হয়েছিল। কবি সুফিয়া কামাল স্নেহসিক্ত ভাষায় যাকে 'প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে' বলে অভিহিত করেছেন।

কুমারী, কিশোরী শাহানা রঙে মেহেদী লাগেনি হাতে
জালিম কাফের পিশাচেরা সেই হাতে
অসহায়া মেয়ে মোর।
শাণিত ছুরিকা হানিয়া কণ্ঠে তোর
তাণ্ডবলীলা শুরু করেছিল, রক্ত বাসনা তুই
পূত পবিত্র একমুঠি ফুল; শেফালি চামেলী জুঁই।

ভালবেসেছিলি এই ধরণীরে, ভালবেসেছিলি দেশ
তাই বুঝি তোর কুমারী তনুতে জড়ায়ে রক্ত বেশ
প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে।[17]

শুধু মেহেরুননেসার প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন তাই নয় আলজেরিয়ার কন্যা জমীলার প্রতি অবিচারে তিনি লিখেছেন 'কারান্তরালে জমিলা'। '৮ মার্চ, নারী দিবস' কবিতায় সুকন্যা, মাতা ভগ্নী ও জায়াকে জাগতে বলেছেন। 'বেণীবিন্যাস সময় তো আর নেই' কবিতায় একাত্তরের করুণ ঘন অন্ধকারে শহীদ শোণিতে রাঙান দেশকে রক্ষা করতে বলেছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে বেড়ে ওঠা সুফিয়া কামাল জানতেন তার অমৃত কন্যারা না জাগলে দেশ জাগবে না:

হে অমৃত কন্যা! পিয়ো তীব্র হলাহল।
ভয় নাই। তব শুভ্র প্রাণ শতদল
রহিবে অম্লান দ্যুতিময়
কণ্ঠে কণ্ঠে ওঠে জয় জয়।
জয় হোক তোমার![18]

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম সাহসী কবি নুরুন নাহার যিনি বুঝেছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তান অচিরেই ভেঙে যাবে। তিনি লিখেছিলেন:

বহুদিন এই নদী বাঁক ঘোরেনি,
বহুদিন সোজা পানি খায়নি মোচড়;
আজ নয়, সেই কবে অনেক বছর!
বহুদিন এই নদী পার ভাঙেনি!!
দুইপারে বহুদিন ফলেনি ফসল,
শিকড় গেঁড়েছে বহু আগাছার দল
বহুদিন তাই নদে জোয়ার জাগেনি![19]

খালেদা এদিব চৌধুরী ষাটের দশকের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল কবি। আমার দেহ আমার হাত (১৯৭৮), পান্থ তোমার ভালোবাসা (১৯৮৩), পাথরের আগুন (১৯৮৫), তোমার অনঙ্গ (১৯৮৬), দুহাতে আঁধার কেটে (১৯৯০), হে বাঁধন লতার কাঁদন(১৯৯৫), দুঁফোটা চোখের জল(১৯৯৭), প্রেমের কবিতা (১৯৯৮), নীরব নার্সিসাস (২০০১), অভিমান আছে বেদনায় (২০০১) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন একটা মুক্ত পৃথিবী আর নির্মল বাতাস যেখানে তিনি প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিবেন। শুভবোধ আর কল্যাণের এই কবি লিখেছেন:

একটা মুক্ত পৃথিবীতে নিঃশ্বাস নেবে বলেই
যুগ যুগ ধরে এতো রক্তঝরা,
এতো প্রতিরোধ, এতটা শ্লোগান!
ফুল ফোটানোর জন্যই তো তপস্যা।
নাও, হাত ভরে নাও খনির উজ্জ্বলতা

নাও মোহন বিশ্বাস, নাও মানুষের কান্না
নাও সভ্যতার যোগসূত্র—সব তুমি নাও।

প্রেমের ক্ষেত্রে খালেদা এদিব চৌধুরীর অনুভূতি প্রকাশের ভিন্নতা সহজেই চোখে পড়ে। পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে প্রেমের অনুভূতি প্রকাশের স্বাতন্ত্রতা আমাদের মুগ্ধ করে।

এক টুকরো ভালবাসায় বনভূমি দাউ দাউ জ্বলে ওঠে
তুমি গোলাপ হয়ে যাবে বলে
কাল সারারাত আমি আমলকি ঝরা পাতার শব্দ শুনেছি
রূপালি মাছের মতোই সে রাত শুয়েছিলো উঠোনে...[20]

ইতিহাসে নারী সবসময়ই উপেক্ষিত কবিতায়ও এ বঞ্চনার ইতিহাস খুব একটা প্রকাশিত হয়নি। নারীকে তার নিজস্ব পরিসর নির্মাণ করতে হবে। আনোয়ারা সৈয়দ হক 'তোমার দুর্বিনত মেয়ে' কবিতায় লিখেছেন;

মাগো, তোমাকে দেখেই শিখেছি
প্রতিবাদী না হলে
কীভাবে বুড়িয়ে যেতে হয় অকালে

'বার বার ঘুমিয়ে যায়' কবিতায় কবি সন্ধান করেছেন নারী কেন বারবার ঘুমিয়ে পড়ে। কবির অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই নারী ঘুমাচ্ছে। সত্তার তাড়না উপেক্ষা করে নারী বারবার ঘুমিয়ে পড়ে কখনো সমাজের চাপে কখনো অভ্যস্ত্যতায়:

আমরা নারীরা ঘুমিয়ে যাই
বার বার ঘুমিয়ে যাই
সত্ত্বার তাড়না উপেক্ষা করে
আমরা ঘুমিয়েছি বহু রাত
... ...
'আর কোনোদিন জাগবো না' এই
স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা ঘুমিয়ে থাকি,
ঘুমিয়ে যাই, যেন অনন্ত এক ঘুমে (বার বার ঘুমিয়ে যাই)

সত্তর দশকের বাংলাদেশের কবিতা এবং পশ্চিমবঙ্গের কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় বহমান। পশ্চিম বঙ্গের রাজনীতিতে সত্তর দশক হচ্ছে মুক্তির দশক। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান নামক যে অদ্ভুত রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকে এদেশের মানুষ হোঁচট খেয়েছিল। '৪৮ থেকে '৫১ পর্যন্ত এদেশের মানুষকে সাংস্কৃতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার যে ষড়যন্ত্র চলে তারই প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২—ও ২১ শে ফেব্রুয়ারি, এবং দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটে ষাটের দশকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রচর্চার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।[21] সত্তর দশকের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে নিপতিত হন কবিরা। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখবো স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যেকটি ঘটনায় নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি আন্দোলনরত

ছাত্রীদের ওপর সামরিক জান্তার পুলিশ বাহিনী লাঠিপেটা করে। ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আসাদুজ্জামান। আসাদের মা ছাত্রনেতাদের উদ্দেশ্যে লিখে পাঠান ' আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলত, 'মা আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে।' আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক করো।[22] ১৯৬৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে শহীদ মিনারে আড়াই হাজার নারী সমবেত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহণ করেছে নারীরা। মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ম—বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারীই সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছে। মুক্তিযুদ্ধে নারীরা তিন ভাবে সহযোগিতা করেছে—সরাসরি যোদ্ধা হিসেবে, স্বামী, সন্তানদের অনুপ্রেরণাদাত্রী হিসেবে এবং অসুস্থ, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দান এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনি ১৯৭১ সালে নারীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করে তা বর্বরতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে। নরখাদকেরা নারীদের নগ্ন করে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যেত এবং পালাক্রমে তাদের ধর্ষণ করত। বন্দী শিবিরে মেয়েদের তিন ভাগে ভাগ করা হতো। প্রথম ভাগে থাকত কিশোরী, দ্বিতীয় ভাগে থাকত যুবতি তৃতীয় ভাগে থাকত গৃহবধূ মধ্য বয়সী নারী। একটা মেয়েকে সাত—আটজন মিলে ধর্ষণ করত। শিশু সন্তানের সামনে মাকে ধর্ষণ করা হতো, শিশুদের মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে মায়েদের ওপর মানসিক নির্যাতন করত। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করত। এমনকি শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার পথেও নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। তবে এইসব নির্যাতিত নারীর মধ্যে কেউ কেউ প্রতিবাদ করেছে, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এ জন্যে বলা যায়।

শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা নয়। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ নারীর লাঞ্ছনা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানীদের পশুরা অগণিত বাঙালি মা বোনকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করেছে, যেখানেই পাকসেনা গেছে সেখানেই তারা ঐ নাপাক কাজ করেছে, প্রতিটি পাকিস্তানী ক্যান্টমেন্ট ও ঘাটির সঙ্গে অপহৃত বাঙালী নারীদের বন্দী শিবির। কতো হতভাগিনী বাঙালী রমণী যে পাকিস্তানী লালসার শিকার হয়েছে সে কলঙ্কিত ইতিহাস চিরকাল অজানা থাকবে।

স্বাধীনতাযুদ্ধে দেশ কেঁপে ওঠে, তছনছ হয়ে ওঠে দেশবাসীর অবস্থান। ত্যাগ ও গৌরবগাঁথার এই নির্মাণকে সৃজন করতে মানুষকে প্রভূত মূল্য দিতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে লিখেছেন মেহেরুননেসা, শাহানা মাহবুব, নুরুন্নাহার শিরীন, নাসিমা সুলতানা, শাহজাদী আঞ্জুমান আরা, রুবী রহমান, কাজী রোজি, শামীম আজাদ, সুরাইয়া খানম, দিলরুবা মিজু প্রমুখ কবি ।

বাংলাদেশের কবিতায় কবি মেহেরুননেছা এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সাংস্কৃতিক আন্দোলন, রাজনীতি এবং সাহিত্যে তাঁর সরব উপস্থিতি। ব্যক্তিক জীবনে লড়াকু এই নারী মানুষ ও সমাজকে ভালোবেসেছেন। নারীর প্রতি নানান ধরনের বঞ্চনা, অত্যাচার আর নিষ্পেষণের চিত্র নারীদের লেখায় সবচেয়ে বেশি প্রস্ফুটিত।

মেহেরুন্নেসা একাধারে রোমান্টিক অন্যদিকে জীবনবাদী কবি। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, সমাজের বৈরিতা ছিল তাঁর প্রেম প্রকাশের অন্তরায়। যেমন:

সূর্যের নীচে পৃথিবী এখন শান্ত ছবির মত
একটি মৌন বাটালী হিলের নিঝুম উপত্যকায়
উন্মন মন—পাখীরা আমার কে জানে কোথায় হারায়।
সেই কথা ভেবে চেয়ে থাকি শুধু আকাশের ঐ নীলে
রাত আসে আর দিন চলে যায় প্রতি প্রত্যহ রোজ
নিছক মৌন ভেবেছি যখন একাকী বাটালী হিলে,
'ফিলিপস্' সেটের সিক্সটি মডেলে কবি মুখরতা খোঁজে।
(মৌন,নের ডায়রীতে, বেগম ৭.৩.৬৫)

কবি মানবতাবাদে বিশ্বাসী। পৃথিবী তাঁকে বঞ্চিত করলেও তিনি পৃথিবীকে বঞ্চিত করতে রাজি নন। তিনি জানেন পৃথিবীতে সত্যিকারের প্রেমের বড় অভাব তারপরও পৃথিবীকেও ভালোবেসেছেন:

এ পৃথিবী কিছু নয়, মনে হয় মরীচিকা ফাঁকি
প্রেম কিছু পাইনিকো পৃথিবীর মন থেকে কভু।
আমার অগাধ প্রেম দিয়েছি তো আমি তবু
নির্জন প্রান্তে ডানা নাড়ে চিন্তার পাখী।
(মনের মনকে, সূর্যজ্যোতির পাখী)

মেহেরুনেনসা স্বশ্রেণির সংকট, প্রকৃতিক দুর্যোগ, গ্রামীণ জীবনের শোষণ বঞ্চনা অর্থাৎ সমকালের যুগযন্ত্রণা নিয়ে লিখেছেন। তাঁর কবিতায় নারী প্রগতিবাদী চেতনার সরাসরি প্রকাশ না ঘটলেও সমাজের অসাম্য, শ্রেণিচেতনা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ চোখে পড়ে। মূলত মেহেরুন্নেসার কবিতার ধরন পাল্টাতে থাকে ১৯৬৬ সালের ছয় দফার পর থেকে। ৬৬'র পর থেকে একুশ নিয়ে প্রতি বছর একাধিক কবিতা লিখেছেন।

মৃত্যুকাতর তরুণ রক্ত রাজপথে দোল খায়
পসই দোল যেন ঠেলে উঠে সারা বাঙলার চেতনায়,
জাগে বাঙালীর মন,
জাগে ফাল্গুনী রোদেও ঝলকে রাঙা পলাশের বন।
দাবীর সড়কে জমা হয় শুধু বেয়নেট কারাগার
গাহসী যাত্রী থামেন, তারা দুরন্ত দুর্বার।
(আজকের শপথ, বেগম, ১৯.০২. ১৯৬৭)

৫২—এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট, ৬২'র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬৬'এর ছয় দফা, ৬৯'এর গণ অভ্যুত্থান, ৭০'এর নির্বাচন, ৭১'এর মুক্তিসংগ্রামের সাথে মেহেরুন্নেসার কবি মানসের গভীর ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। বিরুদ্ধ পরিবেশে দাঁড়িয়ে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়েছেন কবিতার মাধ্যমে।

সুন্দর করে এদেশ সাজাতে
যতবার প্রস্তুতি

ততবার ঝড় বন্যা আনে যে
শত নিদারুণ ক্ষতি।
(প্রস্তুতি, মাসিক কৃষিকথা, নভেম্বর ১৯৭০)

কিন্তু মেহেরুন্নেসা স্বাধীন দেশকে আর সুন্দর করে সাজাতে পারেননি। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ অবাঙালিরা পৈশাচিকভাবে তাঁকে হত্যা করে।

মেয়েদের জীবনের সমস্যাপটের বদল আসতে থাকে সত্তর দশক থেকেই। গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তবতা মেনে নিয়েই তারা আত্মপ্রকাশ করেছে কবিতাতে। শূন্যতা, মৃত্যু নঞর্থক শব্দ সহজেই এদের কবিতায় উঠে এসেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে নিরাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে সত্তর দশকের কবিতায়। কবি সুরাইয়া খানমের কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে এরই প্রতিচ্ছবি:

অগ্নি আমার দেহের আঁচে হয় পুড়ে ছাই ছাই
বাতাস আমার আকাশ খুঁড়ে হয় শুধু ছিনতাই।
এই আভাতে আমি আঁধার আমি হেমের অমা
তুমি আমার অনন্ত পাপ, তুমি আমার ক্ষমা।[23]

সমকালীন কবিদের মধ্যে সুরাইয়া খানম অনেক বেশি প্রতিবাদী কবি। সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা একজন সাহসী নারী।

এই গাছ, কবিতা শোন্ আমার
শোন্ পাথর, কবিতা শোন্ দেওয়াল,
এই শুয়োরের বাচ্চা, শুনে যা আমার কিস্যা,
কুকুরের ছানা শোন্ আমার কবিতা।[24]

কবি দেখেছিলেন পণ্যায়িত পৃথিবীতে প্রেম অনেকটাই নিষ্প্রভ। বিশ্বায়নের যুগে মানুষ তার মূল্যবোধ হারাচ্ছে। পৃথিবী আর রূপকথা সদৃশ নেই। তাইতো কবি লিখেছেন:

তোমরাও আমাকে ছেঁড়ো
আমিও আমাকে ছিঁড়ি
... ...
এই মায়াবন থেকে ফিরে যেতে হলে
এসো ছিঁড়ি, ছিঁড়ে টুকরো করি
এই যে শরীরটুকু, কুটি কুটি করি,
... ...
এখন শুধু হাওয়া, বিরোধী বৈরী বাতাস তড়পাচ্ছে আমাকে।[25]

আশির দশকের নারী কবিরা প্রেমের ক্ষেত্রে অনেকটাই স্পষ্টবাদী। পিতৃতন্ত্র প্রেমের ক্ষেত্রে এতকাল যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে রেখেছিল আশির দশকের নারী কবিরা তা ভেঙে চুরমার করে দিলেন। কবি নাসিমা সুলতানা লিখেছেন:

যদি ভালোবাসি, ভালাবেসে চাই তবে সবটুকু চাই

সামান্য চাইবো না।

... ...

ভালোবাসার জন্যে চাই বিশাল আকাশ উন্মুক্ত প্রান্তর
গভীর জলাশয় দীর্ঘ বেলাভূমি
ভালোবাসার জন্যে চাই চক্ষু—কর্ণ—ওষ্ঠ, নাসিকা ত্বক
আপাদ—মস্তক সমস্ত শরীর।[26]

নাসিমা সুলতানা সত্তর দশকে কুষ্টিয়া থেকে দোর্দান্ড প্রতাপে লিখেছেন। কবি শামসুর রাহমান যার প্রশংসা করে বলেছিলেন 'এই মেয়েটি ভালো লেখে—লেগে থাকালে অনেক দূর যাবে।' কিন্তু সংক্ষিপ্ত জীবন পরিসর তাকে বেশি দূর যেতে দেয়নি। স্বল্প পরিসরের জীবনে কবিতায় তাঁর আত্মকথন রেখে গেছেন।

প্রেমের জন্যে আমি কোন বিদ্রোহ বলিনি
বলিনি চাল—ডাল—তেল ও লবনের সঙ্গে একমুঠো জ্যোৎস্নাও চাই
বৃষ্টিতে চুল খুলে দুহাতে ভাসায় বকুল মেয়েটি।[27]

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তিনি কারণ খুঁজেছেন। কারণ তিনি এই সমাজের ভন্ডামির মুখোশ খুলতে চেয়েছেন:

আমিতো ভাবিনি কখনো ছিঁটিয়েদেব থুতু একজন ভণ্ড যাজকের মুখে
আর মহাজনী ছেনালীর পবিত্র পাছায় আঁকবো সর্বনাশা উল্কি
কখনো জানিনি এই নুলো সভ্যতায়
একটুকরো মানিপ্ল্যান্টের জন্য একজন নারী মুহূর্তেই হয়ে যায় নেহাৎ কুক্কুরী।

একশ্রেণির পুরুষকে তিনি ভরপেট খাদক বলেছেন। যারা নিজেদের বিষয়ে সন্ধিহান। তিনি জানেন না কতটুকু আহারে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। আবার অন্ধকার স্মৃতিফলকের নীচে হাতড়ে দেখলেন সমাজটা পঁচে গেছে:

বাস্তিল দূর্গ যারা গড়ে ভেঙে দেয় অন্য কেউ
ভালবাসা তুমি মরিয়মের ছেলে—বিশুদ্ধ অযৌন অথবা কি লিঙ্গহীন?
ধর্ম ক্যাথলিকের মত চলে যাও উজানের দিকে
তোমার জন্য আমি কোন বিদ্রোহ বলিনি তাই
ভেতরে ভেতরে আমাদের বড় বেশী সর্বনাশ হয়ে গেছে
আমাদের মাংসের ভেতরে ঢুকে গেছে নীল ডুমো মাছি।[28]

সত্তরের অস্থির সময় হারিয়ে ফেলেছেন 'ময়ূর সিংহাসন' সেই সিংহাসন ছিনিয়ে আনতে লিখেছেন:

প্রতিদিন আত্মহত্যা এসে টোকা দেবে দরজায় এমন হয না
প্রতিদিন প্রচীন মুখোশ, পরচুলা আর বেল ফুল নিয়ে কেটে যাবে গন্ধময় বিকেল
এমন হয় না। (কিছু ক্রোধ হোক/ মৃগয়ায় যুদ্ধেও ঘোড়া)

কবি নাসিমা সুলতানা সত্তরের আত্মমগ্ন কবি কিন্তু সমাজ সচেতন। নিজস্বতায় ডুবে থেকেও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন।

জীবনানন্দ দাশ যুগের বন্ধ্যাত্ব, মানুষের কামনার ব্যর্থতা, জীবনের অবসন্নতা ও ক্লান্তি এবং প্রকৃতির বির্বণতা ও হেমন্তের রিক্ততার মধ্যে মৃত্যুকে খুঁজেছেন। নাসিমা সুলতানাও কবিতায় মৃত্যুকে খুঁজেছেন কবির কলমের নিবে।

অবশেষে আমারও মৃত্যুদণ্ড ধার্য হলো হে কবি তোমার কলমে
এক অমোঘ অনিবার্য শীতল ক্ষুরের মতো মৃত্যু
নেমে আসতে আসতে সুতীক্ষ্ণ চকচকে নিবে (কবির মৃত্যু)

কবি ফরিদা মজিদ ঘুম ভাঙা চোখে আকাশ দেখতে চেয়েছেন যে আকাশের প্রত্যাশা সকল নারীর। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি একাধারেও আন্তর্জাতিক ও স্বদেশী। ভারতীয় পুরাণ, কোরআন, বেদ, বিশ্বযুরেদ্ধের অভিঘাত, আণবিক বোমার ভয়াবহতা, চাঁদ, সূর্য, আগ্নেগিরিরি অগ্ন্যুৎপাত, এবং গাঁদাফুলের গেরুয়া অতীত সবই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে। অচেনার উত্তরণ কবিতায় নিপীড়িত, অবহেলিত নারী হৃদয়ে যে নতুন বারতা তার কথা লিখেছেনএভাবে:

ঘুমভাঙা চোখে তুমিও দেখেছিলে
ভোরের এই রাঙানো আকাশ,
যে আকাশে আমি আজ। (অচেনার উত্তরণ)

কবির একমাত্র কাব্যগ্রন্থ গাঁদাফুলের প্রয়াণ ও যারা বেঁচে থাকবে। এই কাব্যের প্রথম কবিতা গাঁদাফুলের প্রয়াণ ও যারা বেঁচে থাকবে কবিতাটি।

বাংলাদেশের কবিতার নারীবাদী ভাবনার অন্যতম কবি তসলিমা নাসরিন (জ. ১৯৬২)। বিশশতকের আশির দশকে ‘সেজুতি’ নামক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তাঁর কাব্যজগতে প্রবেশ করেন। প্রথম কাব্য সংকলন শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা (১৯৮১)। প্রথম কাব্যগ্রন্থে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করেছিলেন পরবতীর্ কাব্যসমূহে শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সেই অগ্নি রক্ষা করে চলেছেন। প্রচলিত প্রথাবদ্ধতাকে ভাঙার জন্য ক্রোধ, যন্ত্রণা, ক্ষোভ থেকে নির্মাণ করছেন নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে(১৯৮৯), আমার কিছু যায় আসে না(১৯৯০), অতলে অন্তরীণ(১৯৯১), বালিকার গোল্লাছুট(১৯৯২), বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা (১৯৯৩), আয় কষ্ট ঝেঁপে, জীবন দেবো মেপে(১৯৯৪),নির্বাসিত নারীর কবিতা(১৯৯৬), জলপদ্য (২০০০), খালি খালি লাগে(২০০৪), কিছুক্ষণ থাকো(২০০৫), ভালোবাসো, ছাই বাসো!(২০০৭), বন্দিনী(২০০৮) কাব্যগ্রন্থ। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি আপোষহীন এবং নিজস্ব নারীসত্তার নির্মিতিতে অনন্য। কবিতায় সরাসরি নারীর অবদমিত বাসনাকে উপস্থিত করেছেন। প্রতীক কিংবা রূপক ব্যবহারের চেয়ে সরাসরি উপস্থাপন রীতিই বেছে নিয়েছেন। নারী—পুরুষের জটিল অভিজ্ঞান নির্মাণে তিনি সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ। শব্দব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রেই পরিমিতিবোধকে অতিক্রম করেছেন। তসলিমা নাসরিনের কবিতা সম্পর্কে শিবনারায়ণ রায় এর মন্তব্য :

সমকালে মেরির মশালকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছেন বাংলাদেশের নিভীর্ক নারীবাদী তসলিমা নাসরিন। বিশ শতকের শেষে, একুশ শতকের সূচনায় বিশ্বব্যাপী যে সমাজবিপ্লব আমার কাছে প্রায় অনিবার্য ঠেকে তার একটি দিকের ভাবরূপ দেখতে পাই তসলিমার রচনায়।[29]

প্রথম কব্যগ্রন্থ শিকড়ে বিপুল ক্ষুধায় তসলিমা নাসরিন জানিয়ে দিচ্ছেন :

শৈশবের গোল্লাছুট থেকে ছুটতে ছুটতে ভুল গন্তব্যে এসে দেখি
বেলা বেড়ে গেছে, লুকোচুরি খেলার সাথী কেউ নেই।[30]

আর তাইতো পরবতীর্ কাব্যসমূহে নারীর বাচন অটুট রাখতে লুকোচুরি করেননি। তসলিমা নাসরিনের কাব্য স্পর্কে তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধাযোগ্য :

তসলিমা নাসরিনকে যদি একটি মেরু বলে ভাবা যায়, অন্য মেরুতে তবে রয়েছেন সেইসব কবিরা যাঁদের রচনায় লিঙ্গ—নিরপেক্ষ অস্তিত্বের তাৎপর্যপূর্ণ বিস্তার লক্ষ করি। আসলে প্রতীচ্যের নারী চেতনাবাদের প্রেরণা নিজের মধ্যে সরাসরি শুষে নিয়ে কবিতা লিখেছেন তসলিমা। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাঙালির সামাজিক প্রেক্ষিতে এর বস্তুগত ভিত্তি দৃঢ় নয় আজও।[31]

তসলিমা তাঁর কবিতায় মানুষ খুঁজেছেন। মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ। সিমোন দ্য বোভেয়ার লিখেছেন কখনো কোনো পুরুষকে ঘোষণা করতে হয় নি 'আমিও মানুষ' কখনো তাকে মানবতায় দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে বই লিখতে হয় নি, যুক্তি সাজাতে হয় নি। কিন্তু নারীকে লিখতে হয়েছে বারবার।[32] তসলিমাও লিখেছেন 'দ্বিপদী চিড়িয়া নই, আমিও মানুষ'। আর তিনি কবিতায় মানুষকেই খঁজেছেন :

একটা জীবন যায় মানুষের সাথে শুয়ে বসে কতটুকু চেনা যায় প্রকৃত মানুষ?
এতকাল ভেবেছি যেমন
যাকে ঠিক যতখানি সঠিক জেনেছি
সে তার কিছুই নয়, যাকে চিনি
আসলে সবচে' বেশি আমি চিনিনা তাকেই।[33]

পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা সবসময়ই নারীকে পেছন থেকে টেনেছে। বাধ্য করেছে তাদের তৈরি বিধি নিষেধের বেড়াজালে বদ্ধ হতে। তসলিমা নাসরিন তা হতে চাননি। তাইতো তিনি লিখেছেন :

আমি সামনে এগোব
পেছনে ডাকছে আমার তাবৎ স্বজন
... ...
আমি যাব
সামনে কিছুই না, একটি নদী
আমি পার হব।
আমি সাঁতার জানি অথচ আমাকে
সাঁতরাতে দেবে না, আমাকে পেরোতে দেবে না।[34]

রুশো বলেছেন, নারী দরকারি অশুভ; শেকসপিয়রের মতে দুর্বলতার নামই নারী, রবীন্দ্রনাথ নারীকে করে তুলেছেন দুর্জ্ঞেয়(অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা)। ফ্রয়েড বানিয়েছেন দেহসর্বস্ব। আর নীৎশে ঞযঁং ঝঢ়ধশব তধৎধঃযঁংঃৎধ গ্রন্থে রীতিমতো খিস্তি করেছেন : নারীরা বন্ধুর উপযুক্ত নয়। তারা এখনো বিড়াল কিংবা পাখি কিংবা বড়জোড় গাভী। পুরুষ নেবে যুদ্ধের প্রস্তুতি, আর নারী হবে যোদ্ধাদের প্রমোদসামগ্রী।[35] তসলিমা নাসরিন তাঁর কবিতায় পুরুষ সর্বস্বতার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে লিখলেন :

সতীত্ব কাহাকে বলে?
আমি এর সংজ্ঞা চাই, ...
পুরুষেরা ভদ্রলোক,
পুরুষের জন্য সতীত্বে সনদ লাগে না।[36]

নারীপ্রগতিবাদীদের শুরুর দিকে চেষ্টা ছিল পুরুষের সমকক্ষ হওয়া, পুরুষকে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছে। কিন্তু পরবর্তীতে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। নারী এখন নিজস্ব বিশ্ব নির্মাণ করতে চায়। তসলিমা নাসরিন কবিতায় সেই নিজস্ব বিশ্বেরঅন্বেষন করেছেন :

দীর্ঘ একটি জীবন একা হাঁটব বলে জুতোর সুকতলা
পুরু করে মোটা সুতোয় গেঁথেছি
দীর্ঘ একটি জীবন কেবল মানুষ দেখব বলে
চশমার কাঁচ পালটেছি, আঙুলের স্নায়ুগুলো
কবজির গোড়ায় দিয়েছি কেটে
মানুষ স্পর্শ করলে যদি সেই মানুষ থেকে
স্পন্দন উঠে এসে আমাকে আবার নাড়ায়![37]

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কখনো স্পষ্ট কখনো প্রচ্ছন্ন। নারী—পুরুষের অপরাধের মাত্রা নির্ণয়ে সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই লিঙ্গ বিভাজিত। যেমন যেকারণে নারী বেশ্যা হয় পুরুষ কিন্তু এই অভিধায় অভিযুক্ত হয় না। তসলিমা নাসরিন কবিতায় দেখিয়েছেন :

যে কারণে নারী বেশ্যা হয়, যে সংসর্গে
একই সংসর্গে অভ্যস্ত হয়ে পুরুষ পুরুষই থাকে।
বেশ্যারা পুরুষ নয়, মানুষের মতো অথচ মানুষ নয়
তারা নারী।[38]

সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস নারী জগতে সকল সৌন্দর্যের আধার। পৃথিবীতে যা কিছু আছে নারীর সৌন্দর্যকে বিশেষায়িত করার জন্য। বিদ্যাপতি থেকে একালের নবীন কবি সকলেই নারীকে সৃষ্টির সেরা শিল্পকর্মের অভিধা দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয় নারী স্তাবকতার কামগন্ধী বর্ণনা। নারী নিজের অজান্তের এই সৌন্দর্যের অতলান্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তসলিমা নাসরিন তাঁর 'অপঘাত' কবিতায় প্রশ্ন করেছেন 'নারীর যদি জন্ম হয়/সবচেয়ে বেশি কী থাকা চাই?/রূপ!'[39] এরপরই তিনি বলেছেন, নারী কি জানে, রূপ আসলে রূপের নীচে তৈরি করে অন্ধকার কূপ। তসলিমা নাসরিন তাঁর কবিতায় লৈঙ্গিক অভিজ্ঞান থেকে মানবিক পরিচয়ে উন্নীত হবার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি মনে করেন পিতৃতন্ত্রের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে ক্ষমতায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পেঁৗছাতে হবে নারীকে।[40] নারীকে রুখে দাঁড়াতে হবে সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে :

নারী তুমি বেঁচে ওঠো
নিশ্বাসে নাও অমল হাওয়া,
এই আকাশ তোমার, আকাশের সব নক্ষত্র তোমার
এই ঝাউপাতা তোমার, এই নদী, এই কাশবন, এই অরণ্য তোমার...[41]

নব্বই এর অন্যতম কবি সুহিতা সুলতানা, কচি রেজা, শাহনাজ মুন্নি, শেলী নাজ প্রমুখ।

সুহিতা সুলতানার কবিতায় দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েত, জৈবনিকতা ও যন্ত্রণা, প্রথাবিরোধীতা, কবিতায় সত্যোচ্চারণ, অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। উপমা প্রতীকের ব্যবহারে কুপমণ্ডুক সময়, সমাজ এবং প্রতিবেশকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ দুঃসহ শুদ্ধতা, অবিরাম শোকার্ত স্বপ্নেরা, অসংখ্য অভিশাপ আমার নিদ্রার ভেতরে, হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে বিষঘুম, শূন্যতার এক আশ্চর্য মহিমা, ভাসে বহুবিধ খেলা, হে জলের অবগুণ্ঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নৈরাজ্যবাদীর মতো আমিও পড়ে আছি ভারসাম্যহীন
জলের ওপর; প্রকৃত অঁাধার এসে জুড়ে বসেছে
এনের ওপর। যেন নিরূপায় আমি
কোথাও আমার কেউ নেই অবিরল নিমজ্জিত
অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে আরণ্যক ভূমি, স্বপ্নের হ্রদ
... ...
জীবনের মর্মে ঢুকেছে বিষঘুম
এখন জীবন ও মন দুই—ই হয়েছে উদ্বিগ্ন।[42]

নব্বইয়ের দশকের শেষ প্রান্তের কবি কচি রেজা। কচি রেজার প্রকৃত নাম নিরজা কামাল। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঠোঁটের গড়ানো রক্তে বিঁধে কাঁটা (১৯৯৯)। এছাড়াও লিখেছেন সহ¯্র অব্দের প্রহর (২০০০), দূরের বেহুলা তুমি (২০০১), ও কষ্ট (২০০৩), দুই চোখের জীবন (২০০৪), প্রসন্ন হও জলপূর্ণ করো তড়াগ (২০০৬), পাশ দিয়ে যায় নাৎসীর গাড়ি (২০০৭), কেবলই করেছি পাঠ বড়– চণ্ডীদাস (২০০৮), অবিশ্বাস বেড়ালের নূপুর (২০০৯), ভুলের এমন দেবতা স্বভাব (২০১১), অন্ধ আয়নাযাত্রা

(২০১২) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ। বিশ্বায়নের যুর্গে নারীর কাছে নানা সূত্রের বাতার্ পেঁাছেছে। নারী নিজেকে নিজের প্রেমকে আরও স্পষ্টভাবে চিনতে শিখেছে। প্রেম আর বন্ধুত্বের সংজ্ঞা এখন আরও স্পষ্ট। প্রেমিকের প্রহেলিকাপূর্ণ আবেদন কিংবা প্রেমহীনতার দোলাচলতা বিশশতকের নারীকে আর ভাবায় না। কচি রেজার 'আমি হিপোক্রেট' কবিতা যেন তারই প্রকাশ:

তোমার ফুলহাতা শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে আমার
আর মাত্র একষট্টিটা বছর তোমার নীল স্ট্রাইপ শার্টের হাতার ভিতর
তোমার হাতের ভিতর আমার হিমলাল হৃদয় নিয়ে তুমুল একটি
শীতকাল কাটাবো একসঙ্গে এক বেসিনে হাত ধোবো
এক থালায় খাবো
যদি কেউ বলে, চারিদিকে হত্যা, কেউ যদি বলে দায় না মিটিয়ে
পালিয়ে যাওয়াৃ
বলব, আমি হিপোক্রেট আমি পরাজিত।[43]

বাংলাদেশেরে নারী কবিদের রচিত কবিতায় ষাটের দশক ছিল নানাবিধ আন্দোলন এবং ভবিষ্যতোর অধরা স্বাধীনতাকে অর্জন করার আকাক্সক্ষা অন্যদিকে সত্তর দশক অর্জিত স্বাধীনতা, মুক্ত স্বাধীন দেশে হৃদয়ে লালিত স্বপ্নগুলো মিলিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। আশির দশকে নারীরা নিজেকে মেলে ধরেছে। নব্বইয়ের দশকের নারী কবিরা স্পষ্টভাষী এবং প্রতিবাদী। নারীর ক্ষেত্রে যে ব্যাক্তি আমি হারিয়ে যায় সংসারের যাঁতাকলে কবিতায় তাঁদের সৃষ্টিশীলতা চোখে পড়ার মতো। সমাজের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা নিজের মননকে প্রকাশে অনেক বেশি সাহসী। বিরুদ্ধ সময় সমাজ এবং প্রতিবেশকে উপেক্ষা করে নারীরা লিখে চলেছে। এবং বাংলাদেশের এই নারী কবিরা হয়তো শিল্পক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাংখ্যিক বৈষম্য হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারবে।

তথসূত্র:

1. ইসলাম, স. ম। (২০১৯, ৫ ডিসেম্বর)। *সুফিয়া কামালের সংগ্রাম.* বাংলাদেশ প্রতিদিন।

2. কামাল, স। (এড.). (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ১৩৪), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

3. ইসলাম, স. ম। (২০১৯, ৫ ডিসেম্বর)। *সুফিয়া কামালের সংগ্রাম,* বাংলাদেশ প্রতিদিন।

4. সাজ্জাদ, স। (২০১৯, ১৫ নভেম্বর)। *সুফিয়া কামাল: নারীর ঘর, নারীর বাহির,* দৈনিক প্রথম আলো।

5. কামাল, স। (এড.). (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ১৩৪), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

6. কামাল, স. (এড.)। (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ১৩৬), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

7. কামাল, স। (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ১৩৫), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

8. খালেক, স। (২০০৯)। *মহিলা সমাজ ও আমাদের সংস্কৃতি* (পৃ. ৪৫), ঢাকা: সম্রাজ্ঞী প্রকাশনী।

9. জাহাঙ্গীর, স। (১৯৯৩)। *সুফিয়া কামাল* (পৃ. ৪৩৮), ঢাকা: নারী উদ্যোগ কেন্দ্র।

10. কামাল, স। (এড.). (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ১৪০), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

11. কামাল, স। (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ১৪৭), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

12. কামাল, স। (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ১৩৬), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

13. সাজ্জাদ, স। (২০১৯, ১৫ নভেম্বর)। 'সুফিয়া কামাল: *নারীর ঘর, নারীর বাহির*', দৈনিক প্রথম আলো ।

14. কামাল, স। (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ২৩৫), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

15. কামাল, স। (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ৩১৬), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

16. সাজ্জাদ, স। (২০১৯, ১৫ নভেম্বর)। 'সুফিয়া কামাল: নারীর ঘর, নারীর বাহির', দৈনিক প্রথম আলো ।

17. কামাল, স। (১৯৮৩)। 'মেহেরুননেসা', *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে কবিতাগুচ্ছ*, মহাম্মদ নুরুল হুদা

(সম্পা, পৃ. ৩), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

18. কামাল, স। (২০০২)। *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* (পৃ. ২৩৫), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

19. সৈয়দ হ, আ। (২০১৯)। 'কবি নুরুন নাহারের কবিতার জগৎ'. *মনন রেখা*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬।

20. চৌধুরী, খ, এ। (১৯৮২)। 'জ্ঞান বৃক্ষের দাহ'. *রফিক ভূঁইয়া ও অন্যান্য, চল্লিশ বছরের প্রেমের কবিতা* (সম্পা, পৃ. ৭৯), ঢাকা: নন্দন ও প্রাচীন প্রকাশনী।

21. সাইফ, হ। (২০১৩, ফেব্রুয়ারি)। 'বাংলাদেশের কবিতা: সত্তরের দশক'. *সাজ্জাদ আরেফিন (এড), নান্দীপাঠ*, সংখ্যা ৫, পৃ. ২৮৭।

22. দৈনিক আজাদ। (১৯৭০, ২৬ জানুয়ারি)।

23. খানম, সু। (১৯৮২)। 'অমর পূর্ণিমা'. *রফিক ভূঁইয়া ও অন্যান্য (সম্পা), চল্লিশ বছরের প্রেমের কবিতা* (পৃ. ৭০), ঢাকা: নন্দন ও প্রাচীন প্রকাশনী।

24. পারভেজ, আ। (২০১৯)। 'নাচের শব্দ'. *মনন রেখা,* বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৭২।

25. খানম, সু। (২০১৫)। *নাচের শব্দ* (পৃ. ৩৪), ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন।

26. সুলতানা, ন। (২০১৯)। 'যদি ভালোবাসি'. *মনন রেখা,* বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬, পৃ. ২৩২।

27. খানম, সু। (১৯৮২)। 'অমর পূর্ণিমা'. রফিক ভূঁইয়া ও অন্যান্য (সম্পা, পৃ. ৭০), *চল্লিশ বছরের প্রেমের কবিতা*।

28. সুলতানা, ন। (১৯৮২)। 'প্রেমের জন্যে'. রফিক ভূঁইয়া ও অন্যান্য, *চল্লিশ বছরের প্রেমের কবিতা* (সম্পা, পৃ. ৭৬), ঢাকা: নন্দন ও প্রাচীন প্রকাশনী।

29. রায়, শি। (২০০৯)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (পৃ. ২০০), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

30. নাসরিন, ত। (২০১২)। *তসলিমা নাসরিন শ্রেষ্ঠ কবিতা* (পৃ. ১৫), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

31. ভট্টাচার্য, ত। (২০০৭)। *নারী চেতনা: মননে ও সাহিত্যে* (পৃ. ১৫১), কলকাতা: পুস্তক বিপনি।

32. ভট্টাচার্য, ত। (২০০৭)। *নারী চেতনা: মননে ও সাহিত্যে* (পৃ. ১৫০), কলকাতা: পুস্তক বিপনি।

33. নাসরিন, ত। (২০১২)। *তসলিমা নাসরিন শ্রেষ্ঠ কবিতা* (পৃ. ১৭), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

34. নাসরিন, ত। (২০১২)। *তসলিমা নাসরিন শ্রেষ্ঠ কবিতা* (পৃ. ২৩), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

35. মজুমদার, স। (২০০৫)। *নারীবিশ্ব বিশেষ সংখ্যা* (সম্পা, পৃ. ৩৯), কলকাতা: অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

36. নাসরিন, ত। (২০১২)। *তসলিমা নাসরিন শ্রেষ্ঠ কবিতা* (পৃ. ৭১), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

37. নাসরিন, ত। (২০১২)।*তসলিমা নাসরিন শ্রেষ্ঠ কবিতা* (পৃ. ৭০), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

38. নাসরিন, ত। (২০১২)। *তসলিমা নাসরিন শ্রেষ্ঠ কবিতা* (পৃ. ৭০), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

39. নাসরিন, ত। (২০১২)। *তসলিমা নাসরিন শ্রেষ্ঠ কবিতা* (পৃ. ৮০), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

40. ভট্টাচার্য, রু। (২০১৩)। *মেয়েদের কবিতা আরেক পৃথিবী* (পৃ. ৮৫), কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

41. নাসরিন, ত। (২০১২)। *তসলিমা নাসরিন শ্রেষ্ঠ কবিতা* (পৃ. ৯০), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

42. সুলতানা, সু। (২০১০)। *ঘাস হয়ে জেগে থাকে প্রাণভূমি* (পৃ. ১৪), ঢাকা: পাঠসূত্র।

43. রেজা, ক। (২০১৯)।'আমি হিপোক্রেট'. *মনন রেখা,* বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬, পৃ. ২৭৪।